ছোট গল্প

দৃষ্টিদান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BENGALI EBOOK
2021

শুনিয়াছি, আজকাল অনেক বাঙালির মেয়েকে নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি, কিন্তু দেবতার সহায়তায়। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিবপূজা করিয়াছিলাম।

আমার আটবৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বজন্মের পাপবশত আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনয়নী আমার দুইচক্ষু লইলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সুখ দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অগ্নিপরীক্ষার আরম্ভ হয়। চোদ্দবৎসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতশিশু জন্ম দিলাম; নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিয়াছিলাম কিন্তু যাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন। যে দীপ জ্বলিবার জন্য হইয়াছে তাহার তেল অল্প হয় না; রাত্রিভোর জ্বলিয়া তবে তাহার নির্বাণ।

বাঁচিলাম বটে কিন্তু শরীরের দুর্বলতায়, মনের খেদে, অথবা যে কারণেই হউক, আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারি পড়িতেছিলেন। নূতন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহবশত চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে তিনি খুশি হইয়া উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে বছর বি. এল. দিবেন বলিয়া কালেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, “করিতেছ কী। কুমুর চোখ দুটো যে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।”

www.bengaliebook.com

আমার স্বামী কহিলেন, “ভালো ডাক্তার আসিয়া আর নূতন চিকিৎসা কী করিবে। ওষুধপত্র তো সব জানাই আছে।”

দাদা কিছু রাগিয়া কহিলেন, “তবে তো তোমার সঙ্গে তোমাদের কালেজের বড়োসাহেবের কোনো প্রভেদ নাই।”

স্বামী বলিলেন, “আইন পড়িতেছ, ডাক্তারির তুমি কি বোঝ। তুমি যখন বিবাহ করিবে তখন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি লইয়া যদি কখনো মকদ্দমা বাধে তুমি কি আমার পরামর্শমতো চলিবে।”

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উলুখড়েরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধিল দাদার, কিন্তু দুইপক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যখন আমাকে দানই করিয়াছেন তখন আমার সম্বন্ধে কর্তব্য লইয়া এ-সমস্ত ভাগাভাগি কেন। আমার সুখদুঃখ, আমার রোগ ও আরোগ্য, সে তো সমস্তই আমার স্বামীর।

সে দিন আমার এই এক সামান্য চোখের চিকিৎসা লইয়া দাদার সঙ্গে আমার স্বামীর যেন একটু মনান্তর হইয়া গেল। সহজেই আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে ছিল, আমার জলের ধারা আরও বাড়িয়া উঠিল; তাহার প্রকৃত কারণ আমার স্বামী কিংবা দাদা কেহই তখন বুঝিলেন না।

আমার স্বামী কালেজে গেলে বিকালবেলায় হঠাৎ দাদা এক ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল, সাবধানে না থাকিলে পীড়া গুরুতর হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কী-সমস্ত ওষুধ লিখিয়া দিল, দাদা তখনি তাহা আনাইতে পাঠাইলেন।

www.bengaliebook.com

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, "দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমার যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।"

আমি শিশুকাল হইতে দাদাকে খুব ভয় করিতাম; তাঁহাকে যে মুখ ফুটিয়া এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব, ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, আমার স্বামীকে লুকাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশুভ বৈ শুভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্‌ভতায় বোধকরি কিছু আশ্চর্য হইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আর ডাক্তার আনিব না, কিন্তু যে ওষুধটা আসিবে তাহা বিধিমতে সেবন করিয়া দেখিস্‌।" ওষুধ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিয়ম বুঝাইয়া দিয়া দাদা চলিয়া গেলেন। স্বামী কালেজ হইতে আসিবার পূর্বেই আমি সে কৌটা এবং শিশি এবং তুলি এবং বিধিবিধান সমস্তই সযত্নে আমাদের প্রাঙ্গণের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সঙ্গে কিছু আড়ি করিয়াই আমার স্বামী যেন আরও দ্বিগুণ চেষ্টায় আমার চোখের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ বেলা ও বেলা ওষুধ বদল হইতে লাগিল। চোখে ঠুলি পরিলাম, চশমা পরিলাম, চোখে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ওষুধ ঢালিলাম, গুঁড়া লাগাইলাম, দুর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া ভিতরকার পাকযন্ত্রসুদ্ধ যখন বাহির হইবার উদ্যম করিত তাহাও দমন করিয়া রহিলাম।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন বোধ হইতেছে। আমি বলিতাম, অনেকটা ভালো। আমি মনে করিতেও চেষ্টা করিতাম যে, ভালোই হইতেছে। যখন বেশি জল পড়িতে থাকিত তখন ভাবিতাম, জল কাটিয়া যাওয়াই ভাল লক্ষণ; যখন জল পড়া বন্ধ হইত তখন ভাবিতাম, এই তো আরোগ্যের পথে দাঁড়াইয়াছি।

www.bengaliebook.com

কিন্তু কিছুকাল পরে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনায় আমাকে স্থির থাকিতে দিল না। দেখিলাম, আমার স্বামীও যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়াছেন। এতদিন পরে কী ছুতা করিয়া যে ডাক্তার ডাকিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, “দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ডাক্তার ডাকিতে দোষ কী। এই লইয়া তিনি অনর্থক রাগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়। চিকিৎসা তো তুমিই করিবে, ডাক্তার একজন উপসর্গ থাকা ভালো।”

স্বামী কহিলেন, “ঠিক বলিয়াছ।” এই বলিয়া সেইদিনই এক ইংরাজ ডাক্তার লইয়া হাজির করিলেন। কী কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল, যেন সাহেব আমার স্বামীকে কিছু ভর্ৎসনা করিলেন; তিনি নতশিরে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি আমার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলাম, “কোথা হইতে একটা গোঁয়ার গোরা-গর্দভ ধরিয়া আনিয়াছ, একজন দেশী ডাক্তার আনিলেই হইত। আমার চোখের রোগ ও কি তোমার চেয়ে ভালো বুঝিবে।”

স্বামী কিছু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, “চোখে অস্ত্র করা আবশ্যক হইয়াছে।”

আমি একটু রাগের ভান করিয়া কহিলাম, “অস্ত্র করিতে হইবে, সে তো তুমি জানিতে কিন্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিয়া গেছ। তুমি কি মনে কর, আমি ভয় করি।”

স্বামীর লজ্জা দূর হইল; তিনি বলিলেন, “চোখে অস্ত্র করিতে হইবে শুনিলে ভয় না করে, পুরুষের মধ্যে এমন বীর কয়জন আছে।”

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, “পুরুষের বীরত্ব কেবল স্ত্রীর কাছে।”

স্বামী তৎক্ষণাৎ ম্লান গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “সে কথা ঠিক। পুরুষের কেবল অহংকার সার।”

আমি তাহার গাম্ভীর্য উড়াইয়া দিয়া কহিলাম, “অহংকারেও বুঝি তোমরা মেয়েদের সঙ্গে পার? তাহাতেও আমাদের জিত।”

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিয়া বলিলাম, “দাদা, আপনার সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতো চলিয়া এতদিন আমার চোখ বেশ ভালোই হইতেছিল, একদিন ভ্রমক্রমে খাইবার ওষুধটা চক্ষে লেপন করিয়া তাহার পর হইতে চোখ যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। আমার স্বামী বলিতেছেন, চোখে অস্ত্র করিতে হইবে।”

দাদা বলিলেন, “আমি ভাবিতেছিলাম, তোর স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে, তাই আরো আমি রাগ করিয়া এতদিন আসি নাই।”

আমি বলিলাম, “না, আমি গোপনে সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতোই চলিতেছিলাম, স্বামীকে জানাই নাই, পাছে তিনি রাগ করেন। ”

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর যশও ক্ষুণ্ন করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশুকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়– মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।

ছলনার ফল হইল এই যে, অন্ধ হইবার পূর্বে আমার দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন, গোপনচিকিৎষা করিতে গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিল; স্বামী ভাবিলেন, গোড়ায় আমার দাদার পরামর্শ শুনিলেই ভালো হইত। এই ভাবিয়া দুই অনুতপ্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া

পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হইল। স্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীতভাবে সকল বিষয়ে আমার স্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে উভয়ের পরামর্শক্রমে একদিন একজন ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া আমার বাম চোখে অস্ত্রাঘাত করিল। দুর্বল চক্ষু সে আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, তাহার ক্ষীণ দীপ্তিটুকু হঠাৎ নিবিয়া গেল। তাহার পরে বাকি চোখটাও দিনে দিনে অল্পে অল্পে অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। বাল্যকালে শুভদৃষ্টির দিনে যে চন্দনচর্চিত তরুণমূর্তি আমার সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উপরে চিরকালের মতো পর্দা পড়িয়া গেল।

একদিন স্বামী আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, “তোমার কাছে আর মিথ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখদুটি আমিই নষ্ট করিয়াছি।”

দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অশ্রুজল ভরিয়া আসিয়াছে। আমি দুই হাতে তাঁহার দক্ষিণহস্ত চাপিয়া কহিলাম, “বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিস তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া দেখো দেখি, যদি কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে আমার কী সান্ত্বনা থাকিত। ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না, সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ। যখন পূজায় ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম– আমার পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকাশের নীল, আমার পৃথিবীর সবুজ সব তোমাকে দিলাম; তোমার চোখে যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মুখে বলিয়ো, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।”

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না; এসব কথা আমি অনেক দিন ধরিয়া ভাবিয়াছি। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ ম্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বঞ্চিত দুঃখিত দুর্ভাগ্যদগ্ধ বলিয়া মনে হইত, তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই-সব কথা বলাইয়া লইতাম; এই শান্তি, এই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। সে দিন কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাঁহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিতেছিলাম। তিনি কহিলেন, “কুমু, মূঢ়তা করিয়া তোমার যা নষ্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তোমার চোখের অভাব মোচন করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।”

আমি কহিলাম, “সে কোনো কাজের কথা নয়। তুমি যে তোমার ঘরকন্নাকে একটি অন্ধের হাঁসপাতাল করিয়া রাখিবে, সে আমি কিছুতেই হইতে দিব না। তোমাকে আর একটি বিবাহ করিতেই হইবে।”

কিজন্য যে বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক তাহা সবিস্তারে বলিবার পূর্বে আমার একটুখানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। একটু কাশিয়া, একটু সামলাইয়া লইয়া বলিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার স্বামী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, “আমি মূঢ়, আমি অহংকারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন ব্রহ্মহত্যা-পিতৃহত্যার পাতকী হই।”

এতবড়ো শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম, কিন্তু অশ্রু তখন বুক বাহিয়া, কণ্ঠ চাপিয়া, দুইচক্ষু ছাপিয়া, ঝরিয়া পড়িবার জো করিতেছিল; তাহাকে সংবরণ করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন

www.bengaliebook.com

তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দের উদ্‌বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি অন্ধ, তবু তিনি আমাকে ছাড়িবেন না। দুঃখীর দুঃখের মতো আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন। এত সৌভাগ্য আমি চাই না, কিন্তু মন তো স্বার্থপর।

অবশেষে অশ্রুর প্রথম পশলাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মুখ আমার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "এমন ভয়ংকর শপথ কেন করিলে। আমি কি তোমাকে নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম। সতিনকে দিয়া আমি আমার স্বার্থ সাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতে পারিতাম না সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম! "

স্বামী কহিলেন, "কাজ তো দাসীতেও করে। আমি কি কাজের সুবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সঙ্গে একাসনে বসাইতে পারি।" বলিয়া আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্মল চুম্বন করিলেন; সেই চুম্বনের দ্বারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেইক্ষণে আমার দেবীত্বে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে মনে কহিলাম, সেই ভালো। যখন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারি না, এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া স্বামীর মঙ্গল করিব। আর মিথ্যা নয়, ছলনা নয়, গৃহিণী রমণীর যতকিছু ক্ষুদ্রতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দূর করিয়া দিলাম।

সেদিন সমস্তদিন নিজের সঙ্গে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গুরুতর শপথে বাধ্য হইয়া স্বামী যে কোনোমতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিয়া রহিল; কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি কহিলেন, 'হয়তো এমন দিন আসিতে পারে যখন এই শপথ-পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঙ্গল হইবে।' কিন্তু আমার

মধ্যে যে পুরাতন নারী ছিল সে কহিল, ‘তা হউক, কিন্তু তিনি যখন শপথ করিয়াছেন তখন তো আর বিবাহ করিতে পারিবেন না।’ দেবী কহিলেন, ‘তা হউক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুশি হইবার কোনো কারণ নাই।’ মানবী কহিল, ‘সকলই বুঝি, কিন্তু যখন তিনি শপথ করিয়াছেন তখন’ ইত্যাদি। বার বার সেই এক কথা। দেবী তখন কেবল নিরুত্তরে ভ্রূকুটি করিলেন এবং একটা ভয়ংকর আশঙ্কার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

আমার অনুতপ্ত স্বামী চাকরদাসীকে নিষেধ করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীর উপর তুচ্ছ বিষয়েও এইরূপ নিরুপায় নির্ভর প্রথমটা ভালোই লাগিত। কারণ, এমনি করিয়া সর্বদাই তাঁহাকে কাছে পাইতাম। চোখে তাঁহাকে দেখিতাম না বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। স্বামীসুখের যে অংশ আমার চোখের ভাগে পড়িয়াছিল সেইটে এখন অন্য ইন্দ্রিয়েরা বাঁটিয়া লইয়া নিজেদের ভাগ বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। এখন আমার স্বামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত, আমি যেন শূন্যে রহিয়াছি, আমি যে কোথাও কিছু ধরিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব হারাইল। পূর্বে স্বামী যখন কালেজে যাইতেন তখন বিলম্ব হইলে পথের দিকের জানালা একটুখানি ফাঁক করিয়া পথ চাহিয়া থাকিতাম। যে জগতে তিনি বেড়াইতেন সে জগৎটাকে আমি চোখের দ্বারা নিজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমার দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। তাঁহার পৃথিবীর সহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আজ ভাঙিয়া গেছে। এখন তাঁহার এবং আমার মাঝখানে একটা দুস্তর অন্ধতা; এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, কখন তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সেইজন্য এখন, যখন ক্ষণকালের জন্য তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদ্যত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়, হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ডাকে।

www.bengaliebook.com

কিন্তু এত আকাঙ্ক্ষা, এত নির্ভর তো ভালো নয়। একে তো স্বামীর উপরে স্ত্রীর ভারই যথেষ্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ড ভার চাপাইতে পারি না। আমার এই বিশ্বজোড়া অন্ধকার, এ আমিই বহন করিব। আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতাদ্বারা স্বামীকে আমি আমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিব না।

অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমন-কি আমার অনেক গৃহকর্ম পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্যের সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। যতটুকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোনো কাজ করিতে দিলাম না, এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্বের মতো আমিই করিতে লাগিলাম।

স্বামী আমাকে কহিলেন, “আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছ।”

আমি কহিলাম, “তোমার প্রায়শ্চিত্ত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন।”

যাহাই বলুন, আমি যখন তাঁহাকে মুক্তি দিলাম তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন; অন্ধ স্ত্রীর সেবাকে চিরজীবনের ব্রত করা পুরুষের কর্ম নহে।

আমার স্বামী ডাক্তারি পাশ করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া মফস্বলে গেলেন।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া যেন মাতৃক্রোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আট বৎসর বয়সের সময় আমি গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে দশ বৎসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছায়ার মতো অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। যতদিন চক্ষু ছিল কলিকাতা শহর আমার চারিদিকে আর-সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোখ যাইতেই বুঝিলাম, কলিকাতা কেবল চোখ ভুলাইয়া রাখিবার শহর, ইহাতে মন ভরিয়া রাখে না। দৃষ্টি হারাইবামাত্র আমার সেই বাল্যকালের পল্লিগ্রাম দিবাবসানে নক্ষত্রলোকের মতো আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারি দিক দেখিতে কিরকম তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভাবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা-ঢালা অড়র এবং সরিষা খেতের আকাশ-ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন-কি, ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মতো আমাকে ঘিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ষু তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের দেহতত্ত্ব-গান গুঞ্জনস্বরে শুনিতে পাইলাম না; সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত

আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পল্লিসঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা অদূরে কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেইসঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড়-জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুনিতে পাই, পুকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাঁসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু গন্ধটুকু আমার চারিদিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

এইসঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভোরবেলায় ফুল তুলিয়া শিবপূজার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ আলোচনা আনাগোনার গোলমালে বুদ্ধির একটু বিকার ঘটেই। ধর্মকর্ম-ভক্তিশ্রদ্ধার মধ্যে নির্মল সরলতাটুকু থাকে না। সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে যেদিন অন্ধ হওয়ার পরে কলিকাতায় আমার পল্লিবাসিনী এক সখী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, “তোর রাগ হয় না কুমু? আমি হইলে এমন স্বামীর মুখ দেখিতাম না।” আমি বলিলাম, “ভাই, মুখ দেখা তো বন্ধই বটে, সেজন্যে এ পোড়া চোখের উপর রাগ হয়, কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন।” যথাসময়ে ডাক্তার ডাকেন নাই বলিয়া লাবণ্য আমার স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম, সংসারে থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞানে অজ্ঞানে ভুলে ভ্রান্তিতে দুঃখ সুখ নানারাকম ঘটিয়া থাকে; কিন্তু মনের মধ্যে যদি ভক্তি স্থির রাখিতে পারি তবে দুঃখের মধ্যেও একটা শান্তি থাকে, নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকাবকি করিয়াই জীবন কাটিয়া যায়। অন্ধ হইয়াছি এই তো যথেষ্ট দুঃখ, তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দুঃখের বোঝা বাড়াইব কেন। আমার মতো বালিকার মুখে সেকেলে কথা শুনিয়া লাবণ্য রাগ

করিয়া অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে, কথা একেবারে ব্যর্থ হয় না। লাবণ্যের মুখ হইতে রাগের কথা আমার মনের মধ্যে দুটো-একটা স্ফুলিঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তবু দুটো-একটা দাগ থাকিয়াছিল; তাই বলিতেছিলাম, কলিকাতায় অনেক তর্ক, অনেক কথা; সেখানে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া আমার সেই শিবপূজার শীতল শিউলিফুলের গন্ধে হৃদয়ের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশুকালের মতোই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবতায় আমার হৃদয় এবং আমার সংসার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি নতশিরে লুটাইয়া পড়িলাম। বলিলাম, “হে দেব, আমার চক্ষু গেছে বেশ হইয়াছে, তুমি তো আমার আছ।”

হায়, ভুল বলিয়াছিলাম। তুমি আমার আছ, এ কথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইটুকু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারো উপরে কোনো জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।

কিছুকাল বেশ সুখে কাটিল। ডাক্তারিতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিসটা ভালো নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া যায়। মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখসঞ্চয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে যেখানে মনের সুখ ছিল জিনিসপত্র আসবাব আয়োজন সেই জায়গাটুকু জুড়িয়া বসে। তখন সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না কিন্তু অন্ধের অনুভবশক্তি বেশি বলিয়া, কিংবা কী কারণ জানি না, অবস্থার সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর পরিবর্তন আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। যৌবনারম্ভে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে-একটি বেদনাবোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। মনে আছে, তিনি একদিন বলিতেন, “ডাক্তারি যে কেবল জীবিকার জন্য শিখিতেছি তাহা নহে, ইহাতে অনেক গরিবের উপকার করিতে পারিব।” যে-সব ডাক্তার দরিদ্র মুমূর্ষুর দ্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট না লইয়া নাড়ি দেখিতে চায় না তাহাদের কথা বলিতে গিয়া ঘৃণায় তাঁহার বাক্‌রোধ হইত। আমি বুঝিতে পারি, এখন আর সেদিন নাই। একমাত্র ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য দরিদ্র নারী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন; শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি, কিন্তু মনের সঙ্গে কাজ করেন নাই। যখন আমাদের টাকা অল্প ছিল তখন অন্যায় উপার্জনকে আমার স্বামী কী চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা জমিয়াছে, এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কী বলিল আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তিদ্বারা বুঝিলাম, তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।

অন্ধ হইবার পূর্বে আমি যাঁহাকে শেষবার দেখিয়াছিলাম আমার সে স্বামী কোথায়। যিনি আমার দৃষ্টিহীন দুই চক্ষুর মাঝখানে একটি চুম্বন করিয়া আমাকে একদিন দেবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কী করিতে পারিলাম। একদিন একটা রিপুর ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর-একটা হৃদয়াবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই যে

www.bengaliebook.com

দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা, ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খুঁজিয়া পাই না।
স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়; কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইয়া উঠে যখন মনে করি, আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই; আমি অন্ধ, সংসারের আলোকবর্জিত অন্তরপ্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষুণ্ন ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি– আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরম্ভে আমি বালিকার করপুটে যে শেফালিকার অর্ঘ্যদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনো শুকায় নাই; আর, আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চিরনবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জনের পশ্চাতে সংসারমরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি যাহা বিশ্বাস করি, যাহাকে ধর্ম বলি, যাহাকে সকল সুখ-সম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতিদূর হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন! কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম; তাহার পরে কখন সে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই; অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক- এক সময় ভাবি, হয়তো অন্ধ বলিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশি করিয়া দেখি। চক্ষু থাকিলে আমি হয়তো সংসারকে ঠিক সংসারের মতো করিয়া চিনিতে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে একদিন তাহাই বুঝাইয়া বলিলেন। সেদিন সকালে একটি বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পৌত্রীর ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। আমি শুনিতে পাইলাম সে কহিল, “বাবা, আমি গরিব, কিন্তু আল্লা তোমার ভালো করিবেন।” আমার স্বামী কহিলেন, “আল্লা যাহা

করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলিবে না, তুমি কী করিবে সেটা আগে শুনি।” শুনিবামাত্র ভাবিলাম, ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বধির করেন নাই কেন। বৃদ্ধ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত 'হে আল্লা' বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি তখনই ঝিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরের খিড়কি-দ্বারে ডাকাইয়া আনিলাম; কহিলাম, “বাবা, তোমার নাতনির জন্য এই ডাক্তারের খরচা কিছু দিলাম, তুমি আমার স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পাড়া হইতে হরিশ ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া যাও।”

কিন্তু সমস্তদিন আমার মুখে অন্ন রুচিল না। স্বামী অপরাহ্নে নিদ্রা হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন।” পূর্বকালের অভ্যস্ত উত্তর একটা মুখে আসিতেছিল– 'না,' কিছুই হয় নাই; কিন্তু ছলনার কাল গিয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, “কতদিন তোমাকে বলিব মনে করি, কিন্তু বলিতে গিয়া ভাবিয়া পাই না, ঠিক কী বলিবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চয় তুমি নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পার, আমরা দুজনে যেমনভাবে এক হইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম আজ তাহা পৃথক হইয়া গেছে।” স্বামী হাসিয়া কহিলেন, “পরিবর্তনই তো সংসারের ধর্ম।” আমি কহিলাম, “টাকাকড়ি রূপযৌবন সকলেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু নিত্য জিনিস কি কিছুই নাই।” তখন তিনি একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “দেখো, অন্য স্ত্রীলোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দুঃখ করে– কাহারো স্বামী উপার্জন করে না, কাহারো স্বামী ভালোবাসে না, তুমি আকাশ হইতে দুঃখ টানিয়া আন।” আমি তখনই বুঝিলাম, অন্ধতা আমার চোখে এক অঞ্জন মাখাইয়া আমাকে এই পরিবর্ত্যমান সংসারের বাহিরে লইয়া গেছে; আমি অন্য স্ত্রীলোকের মতো নহি, আমাকে আমার স্বামী বুঝিবেন না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিস্শাশুড়ি দেশ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বলিলেন, “বলি বউমা, তুমি তো কপালক্রমে দুইটি চক্ষু খোয়াইয়া বসিয়াছ, এখন আমাদের অবিনাশ অন্ধ স্ত্রীকে লইয়া ঘরকন্না চালাইবে কী করিয়া। উহার আর-একটা বিয়ে- থাওয়া দিয়া দাও! ” স্বামী যদি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন ‘তা বেশ তো পিসিমা, তোমরা দেখিয়া-শুনিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও-না’ তাহা হইলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, “আঃ পিসিমা, কী বলিতেছ।” পিসিমা উত্তর করিলেন, “কেন, অন্যায় কী বলিতেছি। আচ্ছা বউমা, তুমিই বলো তো বাছা।” আমি হাসিয়া কহিলাম, “পিসিমা, ভালো লোকের কাছে পরামর্শ চাহিতেছ। যাহার গাঁঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ সম্মতি নেয়।” পিসিমা উত্তর করিলেন, “হাঁ, সে কথা ঠিক বটে। তা, তোতে আমাতে গোপনে পরামর্শ করিব, কী বলিস অবিনাশ। তাও বলি বউমা, কুলীনের মেয়ের সতিন যত বেশি হয়, তাহার স্বামিগৌরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডাক্তারি না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কী ছিল। রোগী তো ডাক্তারের হাতে পড়িলেই মরে, মরিলে তো আর ভিজিট দেয় না, কিন্তু বিধাতার শাপে কুলীনের স্ত্রীর মরণ নাই এবং সে যতদিন বাঁচে ততদিনই স্বামীর লাভ।”

দুইদিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিসিমা, আত্মীয়ের মতো করিয়া বউয়ের সাহায্য করিতে পারে, এমন একটি ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না, সর্বদা ওঁর একটি সঙ্গিনী কেহ থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।” যখন নূতন অন্ধ হইয়াছিলাম তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিংবা ঘরকন্নার বিশেষ কী অসুবিধা হয় জানি না; কিন্তু প্রতিবাদমাত্র না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পিসিমা কহিলেন, “অভাব কী। আমারই তো ভাসুরের এক মেয়ে আছে, যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী।

www.bengaliebook.com

মেয়েটির বয়স হইল, কেবল উপযুক্ত বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে; তোমার মতো কুলীন পাইলে এখনি বিবাহ দিয়া দেয়।” স্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, “বিবাহের কথা কে বলিতেছে।” পিসিমা কহিলেন, “ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্রঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অমনি আসিয়া পড়িয়া থাকিবে।” কথাটা সংগত বটে এবং স্বামী তাহার কোনো সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

আমার রুদ্ধ চক্ষুর অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে ডাকিতে লাগিলাম, “ভগবান আমার স্বামীকে রক্ষা করো।”

তাহার দিনকয়েক পরে একদিন সকালবেলায় আমার পূজা-আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, “বউমা, যে ভাসুরঝির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাঙ্গিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে। হিমু, ইনি তোমার দিদি, ইঁহাকে প্রণাম করো।”

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিসিমা কহিলেন, “কোথা যাস, অবিনাশ।” স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি কে।” পিসিমা কহিলেন, “এই মেয়েটিই আমার সেই ভাসুরঝি হেমাঙ্গিনী।” ইহাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কী বৃত্তান্ত, লইয়া আমার স্বামী বারংবার অনেক অনাবশ্যক বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে কহিলাম, ‘যাহ ঘটিতেছে তাহা তো সবই বুঝিতেছি, কিন্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল? লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, মিথ্যাকথা! অধর্ম করিতে যদি হয় তো করো, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জন্য, কিন্তু আমার জন্য কেন হীনতা করা। আমাকে ভুলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ।’

www.bengaliebook.com

হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে আমার শয়নগৃহে লইয়া গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে দেখিলাম; মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোদ্দপনেরার কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধুর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "ও কী করিতেছ। আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি।"

সেই উন্মুক্ত সরল হাস্যধ্বনিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ যেন একমুহূর্তে কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণবাহুতে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিলাম, "আমি তোমাকে দেখিতেছি, ভাই।" বলিয়া তাহার কোমল মুখখানিতে আর-একবার হাত বুলাইলাম।

"দেখিতেছ?" বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল, "আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগুন যে হাত বুলাইয়া দেখিতেছ কতবড়োটা হইয়াছি?"

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি যে অন্ধ তাহা হেমাঙ্গিনী জানে না। কহিলাম, "বোন, আমি যে অন্ধ।" শুনিয়া সে কিছুক্ষণ আশ্চর্য হইয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম, তাহার কুতূহলী তরুণ আয়ত নেত্র দিয়া সে আমার দৃষ্টিহীন-চক্ষু এবং মুখের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল; তাহার পরে কহিল, "ওঃ, তাই বুঝি কাকিকে এখানে আনাইয়াছ? "

আমি কহিলাম, "না, আমি ডাকি নাই। তোমার কাকি আপনি আসিয়াছেন।"

বালিকা আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দয়া করিয়া? তাহা হইলে দয়াময়ী শীঘ্র নড়িতেছেন না। কিন্তু, বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন।"

এমন সময়ে পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাঙ্গিনী কহিল, “কাকি, আমরা বাড়ি ফিরিব কবে বলো।”

পিসিমা কহিলেন, “ওমা! এইমাত্র আসিয়াই অমনি যাই-যাই। অমন চঞ্চল মেয়েও তো দেখি নাই।”

হেমাঙ্গিনী কহিল, “কাকি, তোমার তো এখান হইতে শীঘ্র নড়িবার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হল আত্মীয়ঘর, তুমি যতদিন খুশি থাকো; আমি কিন্তু চলিয়া যাইব, তা তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি।” এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, “কী বলো ভাই, তোমরা তো আমার ঠিক আপন নও।” আমি তাহার এই-সকল প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। দেখিলাম, পিসিমা যতই প্রবলা হউন এই কন্যাটিকে তাঁহার সামলাইবার সাধ্য নাই। পিসিমা প্রকাশ্যে রাগ না দেখাইয়া হেমাঙ্গিনীকে একটু আদর করিবার চেষ্টা করিলেন; সে তাহা যেন গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসিমা সমস্ত ব্যাপারটাকে আদুরে মেয়ের একটা পরিহাসের মতো উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আবার কী ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে কহিলেন, “হিমু চল্, তোর স্নানের বেলা হইল।” সে আমার কাছে আসিয়া কহিল, “আমরা দুইজনে ঘাটে যাইব, কী বলো ভাই।” পিসিমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষান্ত দিলেন; তিনি জানিতেন, টানাটানি করিতে গেলে হেমাঙ্গিনীরই জয় হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যেকার বিরোধ অশোভনরূপে আমার সম্মুখে প্রকাশ হইবে।
খিড়কির ঘাটে যাইতে যাইতে হেমাঙ্গিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার ছেলেপুলে নাই কেন।” আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, “কেন তাহা কী করিয়া জানিব, ঈশ্বর দেন নাই।” হেমাঙ্গিনী কহিল, “অবশ্য তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল।” আমি কহিলাম, “তাহাও অন্তর্যামী জানেন।” বালিকা

প্রমাণস্বরূপে কহিল, "দেখো-না, কাকির ভিতরে এত কুটিলতা যে উঁহার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।" পাপপুণ্য সুখদুঃখ দন্ডপুরস্কারের তত্ত্ব নিজেও বুঝি না, বালিকাকেও বুঝাইলাম না; কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে তাঁহাকে কহিলাম, তুমিই জান! হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা, আমার কথা শুনিয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা বুঝি কেহ গ্রাহ্য করে"

দেখিলাম, স্বামীর ডাক্তারি ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে লাগিল; দূরে ডাক পড়িলে তো যানই না, কাছে কোথাও গেলেও চট্‌পট্‌ সারিয়া চলিয়া আসেন। পূর্বে যখন কর্মের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহ্নে আহার এবং নিদ্রার সময়ে কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যখন-তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশ্যক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যখন ডাক ছাড়িয়া বলেন, "হিমু, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় তো" , আমি বুঝিতে পারি, পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন-দুইতিন হেমাঙ্গিনী পানের বাটা, তেলের বাটি, সিঁদুরের কৌটো প্রভৃতি যথাদিষ্ট লইয়া যাইত। কিন্তু, তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছুতেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিষ্ট দ্রব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি ডাকিতেন, "হেমাঙ্গিনী, হিমু, হিমি"– বালিকা যেন আমার প্রতি একটা করুণার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত; একটা আশঙ্কা এবং বিষাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে ভ্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমার দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম, দাদার দৃষ্টি তীক্ষ্ম। ব্যাপারটা কিরূপ চলিতেছে তাহা তাঁহার নিকট গোপন করা প্রায় অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড়ো কঠিন বিচারক। তিনি লেশমাত্র অন্যায়কে ক্ষমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধীরূপে দাঁড়াইবেন, ইহাই আমি সবচেয়ে ভয় করিতাম। আমি

অতিরিক্ত প্রফুল্লতা দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম। আমি বেশি কথা বলিয়া, বেশি ব্যস্তসমস্ত হইয়া, অত্যন্ত ধুমধাম করিয়া, চারি দিকে যেন একটা ধুলা উড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু, সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বাভাবিক যে তাহাতেই আরও বেশি ধরা পড়িবার কারণ হইল। কিন্তু, দাদা বেশিদিন থাকিতে পারিলেন না, আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রকাশ্য রূঢ়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদায় লইবার পূর্বে পরিপূর্ণ স্নেহের সহিত আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন; মনে মনে একাগ্রচিত্তে কী আশীর্বাদ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম; তাঁহার অশ্রু আমার অশ্রুসিক্ত কপোলের উপর আসিয়া পড়িল।

মনে আছে, সেদিন চৈত্রমাসের সন্ধ্যাবেলায় হাটের বারে লোকজন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে। দূর হইতে বৃষ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটি-ভেজা গন্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে; সঙ্গচ্যুত সাথিগণ অন্ধকার মাঠের মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকুল ঊর্দ্ধকণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শয়নগৃহে যতক্ষণ আমি একলা থাকি ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না; পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোনো দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্জন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়িয়া আমার অনন্ত অন্ধজগতের জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিলাম; বলিতেছিলাম, "প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় যখন বুঝি না, তখন এই অনাথ ভগ্ন হৃদয়ের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরি; বুক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তবু তুফান সামলাইতে পারি না; আমার আর কত পরীক্ষা করিবে, আমার কতটুকুই-বা বল।" এই বলিতে বলিতে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, খাটের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সমস্তদিন ঘরের কাজ করিতে হয়। হেমাঙ্গিনী ছায়ার মতো কাছে কাছে থাকে, বুকের ভিতরে যে অশ্রু ভরিয়া উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না। অনেকদিন পরে আজ চোখের জল

বাহির হইল। এমনসময় দেখিলাম, খাট একটু নড়িল, মানুষ-চলার উস্‌খুস্‌ শব্দ হইল এবং মুহূর্তপরে হেমাঙ্গিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া আমার চোখে মুছাইয়া দিতে লাগিল। সে যে সন্ধ্যার আরম্ভে কী ভাবিয়া কখন আসিয়া খাটেই শুইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। সে একটি প্রশ্নও করিল না, আমিও তাহাকে কোনো কথাই বলিলাম না। সে ধীরে ধীরে তাহার শীতল হস্ত আমার ললাটে বুলাইয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন মেঘগর্জন এবং মুষলধারে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড় হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না; বহুকাল পরে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া আমার জ্বরদাহদগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

পরদিন হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, তুমি যদি বাড়ি না যাও আমি আমার কৈবর্তদাদার সঙ্গে চলিলাম, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।" পিসিমা কহিলেন, "তাহাতে কাজ কী, আমিও কাল যাইতেছি; একসঙ্গেই যাওয়া হইবে। এই দেখ্‌ হিমু, আমার অবিনাশ তোর জন্যে কেমন একটি মুক্তা-দেওয়া আংটি কিনিয়া দিয়াছে।" বলিয়া সগর্বে পিসিমা আংটি হেমাঙ্গিনীর হাতে দিলেন। হেমাঙ্গিনী কহিল, "এই দেখো কাকি, আমি কেমন সুন্দর লক্ষ্য করিতে পারি।" বলিয়া জানলা হইতে তাক করিয়া আংটি খিড়কি-পুকুরের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। পিসিমা রাগে দুঃখে বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। আমাকে বারংবার করিয়া হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন, "বউমা, এই ছেলেমানষির কথা বিনাশকে খবরদার বলিয়ো না; ছেলে আমার তাহা হইলে মনে দুঃখ পাইবে। মাথা খাও বউমা।" আমি কহিলাম, "আর বলিতে হইবে না পিসিমা, আমি কোনো কথাই বলিব না।"

পরদিন যাত্রার পূর্বে হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দিদি, আমাকে মনে রাখিস।" আমি দুই হাত বারংবার তাহার মুখে বুলাইয়া কহিলাম, "অন্ধ কিছু ভোলে না বোন; আমার তো জগৎ নাই, আমি কেবল

মন লইয়াই আছি।” বলিয়া তাহার মাথাটা লইয়া একবার আঘ্রাণ করিয়া চুম্বন করিলাম। ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া তাহার কেশরাশির মধ্যে আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী বিদায় লইলে আমার পৃথিবীটা শুষ্ক হইয়া গেল– সে আমার প্রাণের মধ্যে যে সৌগন্ধ্য সৌন্দর্য সংগীত, যে উজ্জ্বল আলো এবং যে কোমল তরুণতা আনিয়াছিল তাহা চলিয়া গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারি দিকে, দুই হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, কোথায় আমার কী আছে। আমার স্বামী আসিয়া বিশেষ প্রফুল্লতা দেখাইয়া কহিলেন, “ইঁহারা গেলেন, এখন বাঁচা গেল, একটু কাজকর্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।” ধিক্‌ ধিক্‌ আমাকে। আমার জন্য কেন এত চাতুরী। আমি কি সত্যকে ডরাই। আমি কি আঘাতকে কখনো ভয় করিয়াছি। আমার স্বামী কি জানেন না? যখন আমি দুই চক্ষু দিয়াছিলাম তখন আমি কি শান্তমনে আমার চিরান্ধকার গ্রহণ করি নাই?

এতদিন আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান সৃজন হইল। আমার স্বামী ভুলিয়াও কখনো হেমাঙ্গিনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না, যেন তাঁহার সম্পর্কীয় সংসার হইতে হেমাঙ্গিনী একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে, যেন সেখানে সে কোনোকালে লেশমাত্র রেখাপাত করে নাই। অথচ পত্র দ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেই দিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে, তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয় সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি। কবে তিনি খবর পাইতেন এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু অগোচর ছিল না। কিন্তু, আমিও তাঁহাকে তাহার কথা শুধাইতে পারিতাম না। আমার অন্ধকার হৃদয়ে সেই-যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল সুন্দর তারাটি

ক্ষণকালের জন্য উদয় হইয়াছিল তাহার একটু খবর পাইবার এবং তাহার কথা আলোচনা করিবার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে মুহূর্তের জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দুজনার মাঝখানে বাক্য এবং বেদনায় পরিপূর্ণ এই একটা নীরবতা অটলভাবে বিরাজ করিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠাকুরুন, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবামশায় কোথায় যাইতেছেন? " আমি জানিতাম, একটা কী উদ্যোগ হইতেছে; আমার অদৃষ্টাকাশে প্রথম কিছুদিন ঝড়ের পূর্বকার নিস্তব্ধতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘ আসিয়া জমিতেছিল; সংহারকারী শংকর নীরব অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত প্রলয়শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড়ো করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ঝিকে বলিলাম, "কই, আমি তো এখনো কোনো খবর পাই নাই।" ঝি আর- কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বামী আসিয়া কহিলেন, "দূরে এক জায়গায় আমার ডাক পড়িয়াছে, কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধকরি ফিরিতে দিন-দুই তিন বিলম্ব হইতে পারে।"

আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "কেন আমাকে মিথ্যা বলিতেছ।"

আমার স্বামী কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, "মিথ্যা কী বলিলাম।"

আমি কহিলাম, "তুমি বিবাহ করিতে যাইতেছ! "

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ ঘরে কোনো শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম, “একটা উত্তর দাও। বলো, হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।”

তিনি প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্তর দিলেন, “হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।”

আমি কহিলাম, “না, তুমি যাইতে পারিবে না। তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব। এ যদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী; কী জন্য আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম।”

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। আমি মাটিতে পড়িয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, “আমি তোমার কী অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার ত্রুটি হইয়াছে, অন্য স্ত্রীতে তোমার কিসের প্রয়োজন। মাথা খাও, সত্য করিয়া বলো।”

তখন আমার স্বামী ধীরে ধীরে কহিলেন, “সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতায় ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।”

“আমার বুকের ভিতরে চিরিয়া দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নববিবাহের বালিকা বৈ কিছু নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড়ো করিয়া তুলিয়ো না– আমাকে সর্ববিষয়ে তোমার পায়ের নিচে রাখিয়া দাও।”

আমি কী কী কথা বলিয়াছিলাম সে কি আমার মনে আছে। ক্ষুব্ধ সমুদ্র কী নিজের গর্জন নিজে শুনিতে পায়। কেবল মনে পড়ে, বলিয়াছিলাম, "যদি আমি সতী হই তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্মশপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।" এই বলিয়া আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার মূর্ছা ভঙ্গ হইয়া গেল তখনও রাত্রিশেষের পাখি ডাকিতে আরম্ভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গেছেন।

আমি ঠাকুরঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় বসিলাম। সমস্তদিন আমি ঘরে বাহির হইলাম না। সন্ধ্যার সময়ে কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম না যে, 'হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করো।' আমি কেবল একান্তমনে বলিতে লাগিলাম, "ঠাকুর, আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার তা হউক, কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করো।" সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। এই অনিদ্রায় অনাহারে কে আমাকে বল দিয়াছিল জানি না, আমি পাষাণমূর্তির সম্মুখে পাষাণমূর্তির মতোই বসিয়া ছিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে দ্বার-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। দ্বার ভাঙিয়া যখন ঘরে লোক প্রবেশ করিল তখন আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছি।

মূর্ছাভঙ্গে শুনিলাম, "দিদি!" দেখিলাম, হেমাঙ্গিনীর কোলে শুইয়া আছি। মাথা নাড়িতেই তাহার নূতন চেলি খস্‌খস্‌ করিয়া উঠিল। হা ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল।

হেমাঙ্গিনী মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, “দিদি, তোমার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।”

প্রথম একমুহূর্ত কাঠের মতো হইয়া পরক্ষণেই উঠিয়া বসিলাম, কহিলাম, “কেন আশীর্বাদ করিব না, বোন! তোমার কী অপরাধ।”

হেমাঙ্গিনী তাহার সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, “অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না আর আমি করিলেই অপরাধ?” হেমাঙ্গিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া আমিও হাসিলাম। মনে মনে কহিলাম, ‘জগতে আমার প্রার্থনাই কি চূড়ান্ত। তাঁহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে। যে-আঘাত পড়িয়াছে সে আমার মাথার উপরেই পড়ুক, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস আছে, সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব।’

হেমাঙ্গিনী আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। আমি কহিলাম, “তুমি চিরসৌভাগ্যবতী, চিরসুখিনী হও।”

হেমাঙ্গিনী কহিল, “কেবল আশীর্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগ্নীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহাকে লজ্জা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি। ”

আমি কহিলাম, “আনো।”

কিছুক্ষণ পরে আমার ঘরে নূতন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সস্নেহ প্রশ্ন শুনিলাম, “ভালো আছিস কুমু? ”

আমি ত্রস্ত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম, “দাদা। ”

www.bengaliebook.com

হেমাঙ্গিনী কহিল, “দাদা কিসের। কান মলিয়া দাও, ও তোমার ছোটো ভগ্নীপতি।”

তখন সমস্ত বুঝিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না; মা নাই, তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমিই তাঁহার বিবাহ দিলাম। দুই চক্ষু বাহিয়া হুহু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতেই থামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন; হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘুম হইতেছিল না; আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। লজ্জা এবং নৈরাশ্য তিনি কিরূপভাবে সংবরণ করিবেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতিধীরে দ্বার খুলিল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার স্বামীর পদশব্দ। বক্ষের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আছাড় খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, “তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে যাইতেছিলাম। সেদিন আমি যখন নৌকায় উঠিয়াছিলাম, আমার বুকের মধ্যে যে কী পাথর চাপিয়াছিল তাহা অন্তর্যামী জানেন; যখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয়ও হইতেছিল, সেইসঙ্গে ভাবিতেছিলাম, যদি ডুবিয়া যাই তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হয়। মথুরগঞ্জে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাহার পূর্বদিনেই তোমার দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হইয়া গেছে। কী লজ্জায় এবং কী আনন্দে নৌকায় ফিরিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এই

কয়দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোনো সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।”

আমি হাসিয়া কহিলাম, “না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই, আমি তোমার ঘরের গৃহিণী, আমি সামান্য নারী মাত্র।”

স্বামী কহিলেন, “আমারও একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনো অপ্রতিভ করিয়ো না।”

পরদিন হুলুরব ও শঙ্খধ্বনিতে পাড়া মাতিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে, প্রভাতে রাত্রে, নানা প্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল; নির্যাতনের আর সীমা রহিল না, কিন্তু তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, কী ঘটিয়াছিল, কেহ তাহার লেশমাত্র উল্লেখ করিল না।

www.bengaliebook.com